দণ্ডী

কাব্যলক্ষণাক্রান্ত সংস্কৃত গদ্যকাব্যের ইতিহাসে দণ্ডী, সুবন্ধু এবং বাণভট্টই অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' একটি বিশিষ্ট গদ্যকাব্য। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভের সামান্য পূর্ববর্তী সময়কে দণ্ডীর আবির্ভাব কাল বলে মনে করা হয়। "ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ"—রাজশেখরের এই উক্তি থেকে জানা যায় যে দণ্ডী তিনটি গ্রন্থের প্রণেতা। 'দশকুমারচরিত' নামক গদ্যকাব্য, এবং 'কাব্যাদর্শ' নামক অলংকার গ্রন্থ দণ্ডীর রচনা। কেউ কেউ 'ছন্দোবিচিতি'-কে, আবার কেউ কেউ 'অবন্তিসুন্দরী-কথা'-কে দণ্ডীর তৃতীয় রচনা বলে মনে করেন। 'অবন্তিসুন্দরীকথাসার' গ্রন্থের বিবরণ অনুসারে দণ্ডী বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হলে সরস্বতী ও শ্রুতের দ্বারা পালিত হন। তিনি কাঞ্চীর অধিবাসী ছিলেন এবং কাঞ্চীরাজ নরসিংহবর্মার রাজসভায় উচ্চপদে আসীন ছিলেন। দশকুমারচরিতের রচয়িতা দণ্ডী এবং কাব্যাদর্শ প্রণেতা দণ্ডী একই ব্যক্তি কিনা এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কাব্যাদর্শে দণ্ডী কাব্যের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, দশকুমারচরিতের বহুস্থলে সেই আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন যে, দশকুমারচরিত কবির তরুণ বয়সের রচনা এবং কাব্যাদর্শ পরিণত বয়সের রচনা বলে উভয়ের মধ্যে আদর্শগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[১]

দণ্ডীর প্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য "দশকুমারচরিত" আখ্যায়িকা শ্রেণীর রচনা। গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত—পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা। পূর্বপীঠিকায় আছে পাঁচটি উচ্ছ্বাস এবং উত্তরপীঠিকায় আছে আটটি উচ্ছ্বাস। গ্রন্থটির প্রারম্ভ ও শেষ দুই-ই অসংলগ্ন। সম্ভবতঃ দণ্ডী দশকুমারচরিত গ্রন্থটি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি, অথবা তাঁর রচনার কিয়দংশ নষ্ট হওয়ায় পরবর্তীকালে সেই অংশ অপরের দ্বারা রচিত হয়েছে। 'দশকুমারচরিত'

Scanned with CamScanner

নামানুসারে এই গদ্যকাব্যে দশজন কুমারের বৃত্তান্ত অপেক্ষিত ছিল। কিন্তু প্রথম আটটি উচ্ছ্বাসে আটজন কুমারের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এই অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য পরবর্তীকালে পূর্ব পীঠিকা এবং উত্তরপীঠিকা নামক দুটি অংশ মূল গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হয়। মগধের রাজা রাজহংস মালবরাজ মানসারের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পত্নী বসুমতী সহ বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে রাজার একটি পুত্র জন্মায়। তার নাম রাজবাহন। আরও নয়জন মন্ত্রিপুত্র ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হন। কুমারেরা বয়ঃপ্রাপ্ত ও বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার পর ঋষি বামদেবের পরামর্শে রাজহংস তাঁদের দিগ্‌বিজয় যাত্রার অনুমতি দেন। কুমারেরা দেশভ্রমণে বেরিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে এসে উপস্থিত হন। সেখানে ব্রাহ্মণবেশী কিরাত মাতঙ্গের সঙ্গে রাজবাহনের সাক্ষাত হয়। পাতালকন্যা কালিন্দীর সঙ্গে মাতঙ্গের বিবাহে সাহায্য করার জন্য সকলের অলক্ষ্যে রাজবাহন প্রস্থান করেন। অপরাপর কুমারগণ রাজকুমারের অন্বেষণে বেরিয়ে পর'পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ঘটনাচক্রে তাঁরা আবার একত্রে মিলিত হন এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী ব্যক্ত করেন। 'দশকুমারচরিত' এই দশজন কুমারের অভিজ্ঞতালব্ধ বিচিত্র কাহিনীর রমণীয় আলেখ্যমালা।

দশকুমারচরিত বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তৎকালীন সমাজের নৈতিক অবনতি কবি অকপটে ব্যক্ত করেছেন। লোভ, অসাধুতা, প্রতারণা, গুপ্তপ্রণয়, নারীহরণ, চুরি প্রভৃতি সামাজিক কুৎসিত দিকগুলিরও তিনি বাস্তবোচিত চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। সাধারণভাবে দণ্ডীর রচনারীতি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। গদ্যকাব্যের রীতি অনুযায়ী স্থানে স্থানে গৌড়ী রীতি এবং সমাসবহুল ওজোগুণের সমাবেশ থাকলেও দণ্ডীর রচনা অযথা পাণ্ডিত্যের ভারে ক্লিষ্ট নয়। তাঁর সরল, ললিত এবং সাবলীল বর্ণনার জন্যই এরূপ প্রবাদের উৎপত্তি হয়েছে—"দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্।" ললিতমধুর পদসন্নিবেশ এবং অনুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগবাহুল্য বশতঃ কাব্যের গীতিময়তাই পদলালিত্যের মূল। দণ্ডির রচনার চিত্তাকর্ষক কাহিনীতে এই পদলালিত্য অনায়াসলক্ষ্য। বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে ও বাস্তব চিত্র অঙ্কনে দণ্ডী একজন কুশলী কথাশিল্পী। তাই অধ্যাপক কীথ যথার্থ মন্তব্য করেছেন—"Dandin is unquestionably masterly in his use of language. He is perfectly capable of simple easy narrative, and in the speeches which he gives to his characters he avoids carefully the error of elaboration of language."[১]

সুবন্ধু

সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' অপর একটি উল্লেখযোগ্য গদ্যকাব্য। সুবন্ধুর বাসবদত্তার প্রশংসা করে বাণভট্ট বলেছেন—"কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া[২]।" এর থেকে বলা যায়—

Scanned with CamScanner

সুবন্ধু বাণের পূর্ববর্তী। তবুও সুবন্ধুর আবির্ভাব কাল নিয়ে জটিলতা কমে নি। "ন্যায়স্থিতিমিব উদ্যোতকরস্বরূপাং বুদ্ধসঙ্গতিমিবালংকারভূষিতাম্"—সুবন্ধুর এই রচনাংশ থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, সুবন্ধু এখানে উদ্যোতকার এবং ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে ধর্মকীর্তি রচিত 'বুদ্ধসঙ্গতি' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। বাসবদত্তার সম্পাদক গ্রে তাই সুবন্ধুকে বাণ ও উদ্যোতকারের অন্তর্বর্তীকালের কবিরূপে চিহ্নিত করেছেন। বাসবদত্তার অপর সম্পাদক R. V. Krishnamachariar-এর মতে সুবন্ধু হলেন বাণের উত্তরসূরী এবং আলংকারিক বামনের পূর্ববর্তী। অনেকে আবার সুবন্ধুকে বাণের পরবর্তী কবিরূপে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বাক্‌পতিরাজ তাঁর গৌড়বহ নামক প্রাকৃত ঐতিহাসিক কাব্যে (শ্লোক-৮০০) ভাস, কালিদাস এবং হরিচন্দ্রের সঙ্গে সুবন্ধুর উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বার্ধে এই গ্রন্থটি রচিত। সুতরাং সপ্তম শতকের শেষভাগকে সুবন্ধুর রচনাকালের উত্তরসীমারূপে গ্রহণ করা অসমীচীন নয়। অধ্যাপক কীথ সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়কে সুবন্ধুর আবির্ভাবকাল রূপে উল্লেখ করেছেন—
"..... Subandhu must be placed in the second quarter of the seventh century and that he was only a contemporary of Bāna whose work came to fruition before Bāna's.[১]

সুবন্ধুর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বাসবদত্তার প্রারম্ভিক পদ্যবন্ধে কবি নিজেকে 'সুজনৈকবন্ধুঃ' বলে উল্লেখ করেছেন।[২] এর থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, কবির সুজন নামে এক ভাই ছিলেন। আবার অনেকের মতে সুবন্ধু ছিলেন প্রাকৃত বৈয়াকরণ বররুচির ভাগিনেয়। তবে এসকল মতের কোন ঐতিহাসিক সত্যতা না থাকায় সেগুলি সর্ববাদিসম্মত নয়। এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে কবি কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কবির জন্মস্থান বা বাসস্থান সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য তথ্য দুর্লভ।

সুবন্ধু রচিত বাসবদত্তা শ্লেষপ্রধান কথা জাতীয় গদ্যকাব্য। রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু এবং কুসুমপুরাধিপতি শৃঙ্গারশেখরের কন্যা বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। সুন্দরী রাজকন্যা বাসবদত্তাকে স্বপ্নে দেখে কন্দর্পকেতু বন্ধু মকরন্দের সঙ্গে তার অন্বেষণে বের হন। বাসবদত্তাও এক অনিন্দ্যসুন্দর রাজকুমারের স্বপ্ন দেখে সখী তমালিকার কাছে তা ব্যক্ত করেন। বিন্ধ্যপর্বতের এক অরণ্যে শুকশারীর কথোপকথন থেকে কন্দর্পকেতু জানতে পারেন যে, বাসবদত্তার পিতা কোন এক বিদ্যাধর-রাজকুমারের হাতে কন্যা সম্প্রদান করবেন। একথা শুনে কন্দর্পকেতু বাসবদত্তাকে নিয়ে পলায়ন করেন এবং অরণ্যে রাত্রি অতিবাহিত করেন। সকালে বাসবদত্তা ফলমূল সংগ্রহের জন্য যান। তাঁকে লাভ করার জন্য দুই কিরাতসৈন্য পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ

১ A. B. Keith HSL P-308

Scanned with CamScanner

করে। ঋষির আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ায় ঋষি বাসবদত্তাকে অভিশাপ দেন। বাসবদত্তা পাষাণে পরিণত হন। বাসবদত্তাকে না পেয়ে কন্দর্পকেতু আত্মত্যাগে উদ্যত হলে দৈববাণী হয় যে—হারাণো প্রিয়ার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন হবে। কন্দর্পকেতু বনপথে ঘুরতে ঘুরতে প্রেয়সীর অনুরূপ শিলামূর্তি দেখে তা স্পর্শ করা মাত্রই পাষাণী মূর্তি জীবন্ত হয়ে ওঠে। উভয়ের মিলন হয়। সংক্ষেপে এটাই বাসবদত্তার কাহিনী। গ্রন্থের আখ্যানভাগ নগণ্য হলেও কবির রচনার গুণে তা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। রচনার মধ্যে নিহিত আছে কবির বহুশাস্ত্রে পারঙ্গমতার নিদর্শন। কথালাপের ক্ষেত্রেও সরল বাগ্‌ভঙ্গী প্রশংসনীয়। তবে চরিত্রচিত্রণে ও পরিহাস পরিপাটিতে কবির দৈন্য স্পষ্ট। শ্লেষ, বিরোধাভাস অলংকারের বাহুল্য এবং সমাসবদ্ধ পদের সন্নিবেশ অনেক সময় ভাবপ্রতীতির পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

বাণভট্ট

সংস্কৃত গদ্যকাব্যের জগতে বাণভট্ট কবিসার্বভৌম। আলংকারিকদের মতে গদ্যরচনাই হল কবিলেখনীর নিকষিত হেম—"গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি।" বাণভট্ট গদ্যরচনার পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'হর্ষচরিত'-এর প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে বাণ তাঁর বিস্তৃত-বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। বাৎসায়ন বংশীয় চিত্রভানুর পুত্র বাণ। বাণের পিতামহের নাম অর্থপতি। শৈশবে বাণ মাতৃহারা হন। চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। কিশোর বাণ পিতৃশোকে আকুল হয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির বন্ধুদের সঙ্গে মিশে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন এবং দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ভ্রাতা কৃষ্ণের সহায়তায় তিনি হর্ষবর্ধনের রাজসভায় স্থান লাভ করেন এবং অচিরেই বিদ্বৎপ্রিয় রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালেই (৬০৫-৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) বাণের কবিপ্রতিভা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। বাণভট্ট সংস্কৃত সাহিত্য জগতকে দুটি গদ্যকাব্য উপহার দিয়েছেন—হর্ষচরিত এবং কাদম্বরী।

'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্য। গ্রন্থের প্রথম আড়াইটি উচ্ছ্বাসে বাণ আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, তারপর শুরু হয়েছে পুষ্যভূতি বংশের কাহিনী। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু, গ্রহবর্মার সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ, মালবরাজের দ্বারা গ্রহবর্মার নিধন, রাজ্যশ্রী অপহরণ, গৌড়েশ্বরের চক্রান্তে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু, হর্ষের যুদ্ধযাত্রা, রাজ্যশ্রী উদ্ধার প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার কাব্যোচিত বর্ণনায় হর্ষচরিত সমৃদ্ধ। এটি ইতিহাসের পটভূমিতে রচিত হলেও এখানে ইতিহাস গৌণ, কাব্যশিল্পই মুখ্য হয়ে উঠেছে। দিবাকরমিত্রের আশ্রমে সর্বধর্ম সমাবেশ বর্ণনা, বিন্ধ্যগিরির বর্ণনা, সন্ধ্যা ও যুদ্ধের বর্ণনা প্রভৃতিতে কবির ভূয়োদর্শন এবং বিবিধ শাস্ত্রনিষ্ণাততার ছাপ স্পষ্ট। রাজ্যশ্রীর বিবাহ উপলক্ষ্যে উৎসবের আতিশয্য এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যের সাড়ম্বর বর্ণনা কবির ভূয়োদর্শনেরই ফলশ্রুতি। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুতে প্রিয়জনের শোকবিহ্বলতার বর্ণনা সত্যই মর্মস্পর্শী। কবির বর্ণনায় একদিকে যেমন আছে সমাসবহুল ওজোগুণের সমাবেশ, তেমনি আছে

Scanned with CamScanner

বিষয়ানুগ সরল অনাড়ম্বর বর্ণনার স্নিগ্ধ সরলতা। বর্ণনার বৈচিত্র্যে, শব্দের গাম্ভীর্যে ও মণ্ডনকলার প্রাচুর্যে কবি তাঁর রচনাকে যথার্থ কাব্যধর্মী করে তুলেছেন। হর্ষচরিত যেন অলংকৃত এক অপরূপ কাব্যহর্ম্য।

'কাদম্বরী' বাণের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং কথা জাতীয় গদ্যকাব্য। কল্পনার স্বাধীনতায়, বর্ণনার স্বচ্ছন্দচারিতায় এবং প্রতিভার দীপ্তিতে কবি তাঁর এই কাব্যকে বিচিত্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। 'কাদম্বরী'-শব্দের অর্থ সুরা। সুরার মাদকতায় মানুষ যেমন মত্ত হয়, কাদম্বরী-কাব্যরস পানেও পাঠক তেমনি আনন্দে বিভোর হন, আহারেও তাঁদের রুচি থাকে না। তাই বলা হয়—"কাদম্বরীরস-জ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে।" এই গদ্যকাব্যের পূর্বভাগ বাণের রচনা, উত্তরভাগ রচনা করেন বাণের পুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দ।

কাদম্বরী হল তিন জন্মে সংক্রমিত অমর প্রেমকাহিনী। কাহিনীর বক্তা শূদ্রকের রাজসভায় চণ্ডালকন্যা মাতঙ্গিনীর দ্বারা আনীত একটি শুকপাখী। এর নায়ক চন্দ্রাপীড় এবং নায়িকা কাদম্বরী। নায়ক-নায়িকার প্রেমকাহিনীর পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রণয়বৃত্তান্ত। ব্যাধের হাতে শুকপাখিটির পিতার মৃত্যু হলে জাবালি মুনি তাকে প্রতিপালন করেন এবং তার পূর্বজন্মের কথা শোনান। শুকপাখিটি পূর্বজন্মে ছিল বৈশম্পায়ন এবং রাজা শূদ্রক পূর্বজন্মে ছিলেন চন্দ্রাপীড়। জাবালি-কথিত শুকপাখির পূর্বজন্মের বৃত্তান্তটি হল ঃ—

উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড়। রাজার মন্ত্রী এবং অভিন্নহৃদয় বন্ধু শুকনাসের পুত্রের নাম বৈশম্পায়ন। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় বন্ধু বৈশম্পায়ন ও সখী পত্রলেখার সঙ্গে দিগ্বিজয়ে গেলেন। একদিন রাজকুমার একাকী কিন্নর দম্পতির অনুসরণ করে পথ হারিয়ে উপস্থিত হন অচ্ছোদ সরোবরের নির্জন অরণ্যে। সেখানে শিবমন্দিরে তিনি দেখতে পান তাপসী মহাশ্বেতাকে। অকালে মৃত প্রণয়ী পুণ্ডরীকের সঙ্গে মিলনের আশায় দৈববাণীর উপর আস্থা স্থাপন করে তিনি তপস্যায় ব্রতী হয়েছেন। মহাশ্বেতার সখী গন্ধর্বরাজকন্যা কাদম্বরীকে দেখে চন্দ্রাপীড় মুগ্ধ হন। কাদম্বরীর অন্তরেও লাগে অনুরাগের ছোঁয়া। ইত্যবসরে পিতার আদেশে চন্দ্রাপীড় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুদিন পর পত্রলেখা ফিরে এসে চন্দ্রাপীড়ের কাছে নিবেদন করল কাদম্বরীর প্রেমদশার কথা। এখানেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়েছে বাণভট্টের লেখনী। কবিপুত্র ভূষণভট্টের দ্বারা সমাপ্ত অবশিষ্টাংশের সারকথা হল ঃ—বন্ধু বৈশম্পায়নের অন্বেষণে চন্দ্রাপীড় পুনরায় মহাশ্বেতার কাছে উপস্থিত হন। এদিকে মহাশ্বেতাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে তাঁর অভিশাপে বৈশম্পায়ন শুকপাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। বন্ধুর এই হৃদয়বিদারক পরিণতির কথা শুনে চন্দ্রাপীড় প্রাণত্যাগ করেন। চন্দ্রাপীড়ের বিরহে কাদম্বরী প্রাণত্যাগে উদ্যত হলে দৈববাণী হয় যে—মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী নিজনিজ প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবেন। জাবালির মুখ থেকে এই কাহিনী শুনে শূদ্রক এবং শুকপাখী উভয়েরই পূর্বস্মৃতি জাগরিত হল। উভয়েই দেহত্যাগ করলেন। অপরদিকে

Scanned with CamScanner

চন্দ্রাপীড় সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জীবিত হয়ে কাদম্বরীর সঙ্গে মিলিত হলেন। বৈশম্পায়নও পুণ্ডরীকরূপে প্রাণ ফিরে পেয়ে মহাশ্বেতার সঙ্গে মিলিত হলেন। উজ্জয়িনীতে ফিরে পুণ্ডরীকের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীকে নিয়ে কখনো হেমকূটে, কখনো বা কাদম্বরীর ঈপ্সিত কোন রমণীয় স্থানে সুখে কাল কাটাতে লাগলেন।

কাদম্বরীতে বাণের কবিপ্রতিভা যেন সমগ্রতায় পূর্ণ হয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বিদগ্ধমুখমণ্ডনে ধর্মদাস বাণের রচনার প্রশংসা করে বলেছেন—

"রুচিরস্বরবর্ণপদা রসভাববতী জগন্মনোহরতি।
তৎ কিং তরুণী ন হি ন হি বাণী বাণস্য মধুরশীলস্য।।"

বর্ণনার কল্পতরু বাণের অসামান্য বর্ণননৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গোবর্দ্ধনাচার্য তাঁকে বাগ্‌দেবীর অবতাররূপে অভিহিত করেছেন—

"জাতা শিখণ্ডিনী প্রাগ্ যথা শিখণ্ডী তথাবগচ্ছামি।
প্রাগ্‌লভ্যমখিলমাপ্তুং বাণী বাণো বভূবেতি।।"

শ্লেষে, শব্দওস্ফনে, রসে, অলংকারে ও সদর্থবিষয়ক কথাবর্ণনে বাণ যথার্থই পঞ্চানন ছিলেন। বাণের এই প্রশস্তি কেবল ভাবোচ্ছ্বাস নয়, প্রশস্তিকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেরই প্রকাশ। বাণের চিত্তভূমি যেন এক আশ্চর্য রঙিন কল্পলোক। আর কাদম্বরী হল সেই কল্পলোকের এক বর্ণাঢ্য কল্পচিত্র। কবির অন্তরে প্রতিভাসিত জগতের অনাবিল আনন্দধারাকে তিনি তাঁর বর্ণনায় উপস্থাপিত করেছেন অনন্ত বৈচিত্র্যে। কবি ক্লান্তিহীনভাবে একের পর এক বর্ণনা উপস্থাপিত করেছেন, একের পর এক চিত্র এঁকেছেন। এমন কোন উপমা নেই, এমন কোন উপমান নেই, এমন কোন অলংকার নেই যা বাণভট্ট তাঁর কাব্যে উপস্থাপিত করেন নি। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কবির পাণ্ডিত্যের নিদর্শন তাঁর বর্ণনার বহুস্থলে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি নিজে হর্ষচরিতে বলেছেন—"সম্যক্ পঠিতঃ সাঙ্গো বেদঃ শ্রুতানি যথাশক্তি শাস্ত্রাণি।" এমন কোন বিষয় নেই যা বাণের সর্বাতিশায়ী প্রতিভার রশ্মিতে ধরা পড়ে নি। তাই বাণের সম্পর্কে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে—"বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্।" কি বিষয় বর্ণনে, কি চরিত্রচিত্রণে কি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের বাস্তব চিত্র উপস্থাপনে—সর্বত্রই কবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অনন্যসুলভ চিত্রগ্রহিতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

পাঞ্চালী রীতিরসিক বাণের বর্ণনার মাঝে মাঝে সমাসবহুল দীর্ঘ বাক্য ও দুরূহ শব্দের সন্নিবেশ আছে যা পাঠককে ভীতিবিহ্বল করে তোলে। তাই জার্মান সমালোচক weber বাণের রচনাকে দুর্গম ও শ্বাপদসংকুল ভারতীয় অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—"Bana's prose is an Indian wood where all progress is rendered impossible by the undergrowth, until the traveller cuts out a path for himself and where even then he has to recon with malicious wild beasts in the shape of uncommon words that afright him." বাণের রচনার

Scanned with CamScanner

এই প্রতিকূল সমালোচনা বস্তুতঃ সমালোচকের অতিশয়োক্তি। মনে হয় এই বিদগ্ধ বিদেশী সমালোচক স্বচ্ছন্দে প্রবহমান বাণের কাব্যধারার প্রাণস্পন্দনকে সঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। গদ্যকাব্য রচনার ক্ষেত্রে বাণের পূর্বসূরীরা যুগরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচনাশৈলীকে দরবারী ঘরানার যে চড়া সুরের উঁচু পর্দায় বেঁধে দিয়েছিলেন, তার থেকে নেমে আসার সাধ্য বাণের ছিল না। কাজেই বর্তমান যুগের মাপকাঠিতে অতীত যুগের সাহিত্যকে বিচার করলে চলবে না। বাণের কাব্যের বিচার করতে হলে সমালোচককেও বাণের সমসাময়িক সহৃদয় পাঠকবর্গের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। তবে একথা ঠিক যে, বাণের কাব্যকাননে বিচিত্র পুষ্পের বর্ণাঢ্য সমারোহ থাকলেও সেখানে সাধারণের প্রবেশ দুষ্কর।

শ্বেতাম্বর জৈন ধনপালের 'তিলকমঞ্জরী' অপর একটি গদ্যকাব্য। ধারাধিপতি বাক্‌পতিরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষদিকে কবি এই কাব্য রচনা করেন। কাব্যের প্রারম্ভিক কয়েকটি শ্লোকে পরমারবংশীয় রাজাদের সঙ্গে বাণ, ভবভূতি, রাজশেখর, রুদ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতি কবিদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এখানেই ধনপাল 'তরঙ্গবতী' ও 'ত্রৈলোক্যসুন্দরী' নামে দুটি কথাকাব্যের নামও উল্লেখ করেছেন। 'তিলকমঞ্জরী'র মূল উপজীব্য বিষয় হল তিলকমঞ্জরী ও সমরকেতুর প্রণয়কাহিনী। নায়িকা তিলকমঞ্জরীর চরিত্রে বাণের কাদম্বরীর চিত্র স্পষ্ট।

সোড্ঢলের 'উদয়সুন্দরীকথা' রাজা মলয়বাহনের সঙ্গে উদয়সুন্দরীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ১০২৬ খ্রীঃ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কাব্যটি রচিত। দিগম্বর জৈন ওডয়দেব বাদীবসিংহের 'গদ্যচিন্তামণি' একাদশ লম্বকে বিভক্ত গদ্যকাব্য। সত্যধর ও জীবন্ধরের কাহিনী অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। বামনভট্টবাণের 'বেমভূপালচরিত' এই শ্রেণীর রচনা। এই গদ্যকাব্যে বাণের হর্ষচরিতের অন্ধ অনুকৃতি সহজেই অনুমেয়। দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণের প্রতিভার দীপ্তিতে সংস্কৃত গদ্যকাব্যের আলোকিত সরণি পরভাবী স্বল্প-প্রতিভাধর কবিদের হাতে কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। তবুও এই কাব্যগুলি সংস্কৃত গদ্যকাব্যের ভাণ্ডারকে অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছে।

Scanned with CamScanner